তারিখ 10 JAN 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 6

ভাবিয়া করিও কাজ...

সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ | ড. এম এম আকাশ

অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাসের অনেক বড় বড় ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে ক্ষুদ্র একটি ঘটনা থেকে। পাকিস্তান আমলে আইয়ুব খান ছিলেন দেশের প্রেসিডেন্ট। অফিস ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। সে সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ছাত্রাবাসে খাবারের ডাল পাতলা হলে স্লোগান উঠত এভাবে– 'হলের ডালে পানি কেন, আইয়ুবশাহি জবাব চাই'। এ ব্যাপারে হয়তো প্রেসিডেন্টের সরাসরি কিছুই করার ছিল না। কিন্তু দেশের অনেক সমস্যার জন্য তিনিই দায়ী– এমন মনোভাব ক্রমে দানা বাঁধছিল এবং তারই পরিণতিতে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে ছাত্র-জনতা প্রবল ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাকে ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে হয়। এ তো প্রায় পাঁচ দশক আগের কথা। এক দশকেরও কম সময় আগে ২০০৭ সালের আগস্ট মাসের কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে এক দর্শকের (ছাত্র) ছাতায় দৃষ্টি আটকে যায় এক সেনা সদস্যের এবং তার প্রতিক্রিয়ায় ক্যাম্পাসে থাকা আর্মি ক্যাম্পের কিছু সদস্যের আচরণকে ছাত্রছাত্রীরা মনে করেছে অন্যায়। এ ঘটনার ধারাবাহিকতায় উদ্ভূত ঘটনাপ্রবাহের কারণে ওয়ান-ইলেভেনের কুশীলবরা হার মানতে বাধ্য হন। বাংলাদেশ ফের ফিরে যেতে পারে গণতান্ত্রিক ধারায়। এ ধরনের তুচ্ছ ঘটনা থেকে বৃহৎ ঘটনা সৃষ্টির আসল কারণ কিন্তু তুচ্ছ ঘটনাটি নয়। আসল কারণ নিহিত থাকে ইতিহাসের সঞ্চিত বারুদে। তুচ্ছ ঘটনাটি সাধারণত দেশলাইয়ের কাঠির কাজ করে। সর্বাধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্র এখন 'Chaos Theory'-এর কথা বলছে। এ তত্ত্ব অনুযায়ী ভারতবর্ষে কোনো প্রজাপতির পক্ষস্পন্দনের কারণে আটলান্টিকের তীরের লন্ডনে ভূমিকম্প হয়ে যেতে পারে। আমার ধারণা, বাংলাদেশ এখন সে ধরনের একটি সঞ্চিত বারুদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। যে কোনো সামান্য রাজনৈতিক বিবাদ ঠিকভাবে ম্যানেজ করা না গেলে সেখান থেকে বড় বিপদ ঘটতে পারে। দাবানল সৃষ্টিও সম্ভব। গ্রামসির তত্ত্ব অনুযায়ী, রাজনৈতিক ঘটনার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শাসক শ্রেণী দুই ধরনের কৌশল গ্রহণ করে থাকে। প্রথমত, বেসামরিক কৌশল। লোকসমাজের মধ্যে নানা ধরনের তত্ত্ব ও আদর্শ প্রচার করে, অর্থ ও প্রলোভন ছড়িয়ে কিংবা বুঝিয়ে-সুজিয়ে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীকে শান্ত করা। এ ধরনের খেলা বাংলাদেশে চলছে মূলত এনজিও, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম এবং সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে। তবে এ কৌশল সব সময় কার্যকর নাও হতে পারে। আর তা সত্যিই যদি ব্যর্থ হয় তাহলে শাসক শ্রেণী নখ, দাঁত দেখায়। তারা বলপ্রয়োগের পথ অনুসরণ করে এবং এভাবে আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। দ্বিতীয় কৌশলের প্রধান যন্ত্র হচ্ছে সামরিক-বেসামরিক প্রশাসন এবং আইন-আদালত। নাগরিক সমাজের ভদ্র রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মাথার ওপর এই ঝুলন্ত হুমকির নাম হচ্ছে 'ডেমোক্লেসের তরবারি'। বাংলাদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন নিয়ে বর্তমান সরকার তার কতিপয় মুখপাত্রের অবিমৃষ্যকারী আচরণের জন্য সরাসরি মুখোমুখি অবস্থানে চলে গেছে। এর কোনো হেতু ছিল না, এমনটিই বেশিরভাগ মানুষের ধারণা। কারণ শিক্ষকদের দাবি খুবই সামান্য। তাদের দাবি ছিল, আগের বেতন স্কেলে শিক্ষকরা যে টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেডের সুবিধা ভোগ করতেন, সেটা বহাল রাখতে হবে। শিক্ষকরা এ দাবির বিষয়েও নমনীয় হয়ে বলেছিলেন– এ দুটি সুবিধা বাতিল করা হলেও তাদের মূল পয়েন্ট হচ্ছে পদমর্যাদার ক্ষেত্রে সচিব এবং সিনিয়র সচিবদের সমপর্যায়ে যাওয়ার একটি পথ উন্মুক্ত রাখা। কারণ টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড বাতিল হলে এ রাস্তাটি বন্ধ হয়ে যায়। সরকার যদি তারপরও এ প্রথা বাতিল করতে চায় তাহলে শিক্ষকদের পদোন্নতির বিকল্প একটি পথ দেখিয়ে দিতে হবে। হতে পারে নতুন ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স তৈরি করা। হতে পারে নতুন শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন স্কেল তৈরি করা, যা অনেক দেশে রয়েছে। হতে পরে শিক্ষকদের পদোন্নতির নিয়মকানুন ঠিক করে দিয়ে পদোন্নতির দরজা ও ধাপগুলো চিহ্নিত করে দেওয়ার মাধ্যমে। এ পথ তৈরির সময় কেবল খেয়াল রাখতে হবে, আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক এক নম্বর গ্রেডে যাওয়ার ক্ষেত্রে যে সুযোগ পেতেন (অর্থাৎ যতটুকু প্রোবাবিলিটি রক্ষিত হতো), ততটুকু যাতে নতুন পদ্ধতিতেও অক্ষুণ্ন থাকে। এই অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত দাবির বিরুদ্ধে সরকারের অবস্থান গ্রহণের হেতু ছিল না। একমাত্র হেতু হতে পারে প্রশাসনের ক্যাডারদের প্রতি সরকারের বিশেষ পক্ষপাতিত্ব। সামরিক বাহিনী এবং পুলিশের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব। সবচেয়ে আতঙ্কজনক হচ্ছে, এই দুই ধারার শীর্ষস্থানীয় অল্প কয়েকজন ব্যক্তিকে অষ্টম বেতন কাঠামোতে ড. ফরাসউদ্দিনকৃত সুপারিশের বাইরে নিয়ে এসে একটি সুপার গ্রেড তৈরি করে প্লেস করা হয়েছে। এতে শাসক শ্রেণীর ভেতরেও অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। একজন মন্ত্রী বলেছেন, তার সুপারিশকৃত বিধান লঙ্ঘন করে অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে এ কাজ করা হয়েছে। অন্য মন্ত্রীরাও বলছেন, শিক্ষকদের এভাবে মর্যাদাহানি করা সরকারের জন্য ক্ষতি হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকের খবর জানার সুযোগ আমার নেই। সংবাদপত্র দেখে তাদের মতো কেবল অনুভব করতে পারি। সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যে চমৎকৃত হয়েছি। তিনি বলেছেন, 'সম্মানিত শিক্ষকরা সমাজের বিবেক। শিক্ষকদের সম্মান সবসময়ই সবার ওপরে। তাদের তুলনা কারও সঙ্গে চলে না।... আমি প্রধানমন্ত্রী হতে পারি; কিন্তু আমার শিক্ষকদের সম্মান সবার ওপরে।'

তাহলে দেখুন রাজনৈতিক সংঘাত কোথায়। রাজনৈতিক মহল সামগ্রিক বিবেচনায় যে সব রাজনৈতিক বক্তব্য দিচ্ছেন, প্রশাসন তা লঙ্ঘন করছে বা তার সঙ্গে একমত হতে পারছে না। প্রধানমন্ত্রীকে দেশ চালাতে হলে একই সঙ্গে সিভিল সোসাইটি বা লোকসমাজের সন্তুষ্টি ও সম্মতি আদায় করতে হবে। আবার তাকে বৈরী শক্তি মৌলবাদ-জঙ্গিবাদ ও ধর্মাশ্রয়ী দলগুলোর বিরুদ্ধে প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগের হাতিয়ার অটুট রাখতে হবে। এ হাতিয়ার হচ্ছে সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছেন জেনারেল ও সচিবরা। এখন প্রধানমন্ত্রীকে ঠিক করতে হবে– শ্যাম রাখি না কুল রাখি। ইতিমধ্যেই শিক্ষকরা ১১ জানুয়ারি থেকে সব পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। এক সময় মাত্র ঢাকা ও রাজশাহীর মতো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সরকারের নিয়ন্ত্রণে। এখন এ সংখ্যা প্রায় ৪০টি। এটাও মনে রাখা ভালো যে, শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের একটি সম্পর্ক রয়েছে। শিক্ষকরা ইতিমধ্যেই তাদের দাবির ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সচেতন করেছেন। আমি যতটা বুঝতে পেরেছি, ছাত্রছাত্রীদের মতও প্রধানমন্ত্রীর মতের অনুরূপ। তাদের ভাষায়, যারা আগামী দিনের সচিব ও জেনারেল তৈরি করবেন তাদের মর্যাদা সবসময়ই সবার ওপরে থাকা উচিত। সাধারণ দৃষ্টিতে স্রষ্টাকে সৃষ্টির ওপরেই মর্যাদা দেওয়া থাকে। সবদিক বিবেচনায় একটি রাজনৈতিক সংকট ক্রমশ পেকে উঠছে। এ অবস্থায় শিক্ষকদের ওপর যে কোনো ধরনের হামলা পরিস্থিতিকে অসমাধানযোগ্য দ্বন্দ্বের দিকে ঠেলে দিতে পারে। কেউ কেউ মনে করেন, আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন শাসক দলের শাখা-প্রশাখা শিক্ষক সংগঠনের নেতারাই। সুতরাং, তারা শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যাবেন বা আপস করবেন। কিন্তু আমি মনে করি, শিক্ষক সমিতিগুলোর এক ধরনের আপেক্ষিক স্বাধীনতা রয়েছে (Relative autonomy)। প্রশাসনকে হুকুম দিয়ে কাজ করানো সহজ। রাজনৈতিক দলের ভেতরে এক ধরনের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব জারি আছে। কিন্তু পেশাজীবী সংগঠনগুলোকে সে ধরনের বশংবদ সত্তা ভাবলে কর্তৃপক্ষ ভুল করবে। ঘটনাপ্রবাহ কীভাবে আকস্মিক আয়তের বাইরে চলে যায়, সেটা লেখার শুরুতে বলেছি। এ লেখা শেষ করব একটি সতর্কবার্তা দিয়ে– ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না।

মনে রাখা ভালো যে, শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের একটি সম্পর্ক রয়েছে। শিক্ষকরা ইতিমধ্যেই তাদের দাবির ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সচেতন করেছেন। আমি যতটা বুঝতে পেরেছি, ছাত্রছাত্রীদের মতও প্রধানমন্ত্রীর মতের অনুরূপ। তাদের ভাষায়, যারা আগামী দিনের সচিব ও জেনারেল তৈরি করবেন তাদের মর্যাদা সবসময়ই সবার ওপরে থাকা উচিত। সাধারণ দৃষ্টিতে স্রষ্টাকে সৃষ্টির ওপরেই মর্যাদা দেওয়া থাকে। সবদিক বিবেচনায় একটি রাজনৈতিক সংকট ক্রমশ পেকে উঠছে। এ অবস্থায় শিক্ষকদের ওপর যে কোনো ধরনের হামলা পরিস্থিতিকে অসমাধানযোগ্য দ্বন্দ্বের দিকে ঠেলে দিতে পারে